শাফিন রাশেদের ছোট গল্প

প্রথম রোদ্দুর

নয়নের জন্মদিন আজ।

হলে দুপুরের খাওয়া সেরে পল্টনে চলে আসি। নয়ন আমার ফুপাতো ভাই। জুঁই এবং নয়ন- দুই ভাই-বোন মিলে ঘর সাজাতে শুরু করেছে।

আমি পৌঁছাতেই জুঁই বলল, মাসুদ ভাই, আপনার দায়িত্ব ডাইনিং টেবিলের পেছনের দেয়ালটা সাজানো। টেবিলে কেক কাটা হবে। তখন কিছু ছবি তোলা হবে। সুতরাং টেবিলের পেছনটি সুন্দর করে সাজানো চাই।

-ছবি তুলবে কে? জানতে চাই।

-আমার এক বান্ধবী আসবে ক্যামেরা নিয়ে। ভিডিও ক্যামেরা, খুব নাকি ভালো ছবি ওঠে। জানালো জুঁই। তবে সবার আগে আপনি কিছু খেয়ে নিন।

-আমি খেয়ে এসেছি হল থেকে। আমি বরং কিছু সাজানোর কাগজ কিনে আনি। কেটে বিভিন্ন ডিজাইন করা যাবে।

ফুপু চা ও চানাচুর খেতে দিলেন। সবার জন্য চা এলো। খেয়ে আমি ফকিরাপুলের দিকে বেরিয়ে যাই। একটা দোকান পেয়ে যাই। বিয়েতে ঘর সাজানোতে যা যা লাগে সব আছে। জন্মদিনের জন্য যা কিছু লাগে তাও পাওয়া গেল। কাগজের অনেক ডিজাইন–ফুল, চেইন, অক্ষর, রঙিন বেলুন ইত্যাদি। আমি এগুলো নিয়ে ফিরে আসি।

-মাসুদ ভাই, কাগজ কেটে অক্ষর করা আমি বেশ ভালো পারি। এ কাজটা আমি করতে চাই। দেখবেন দোকানের থেকে ভালো হবে। বলে জুঁই।

-ঠিক আছে, করো।

ফুপা একটা বড় কেকের প্যাকেট নিয়ে ঢুকেন। আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, কখন এলে ? তুমি ভালো আছ তো?

-জ্বি, ভালো আছি। আমি তাঁর পায়ে হাত দিয়ে সালাম করি।

ফুপা আমার মাথায় হাত রেখে বলেন, থাক, থাক। ভালো থেকো বাবা।

জুঁই নানান রঙের কাগজ কেটে 'নয়নের শুভ জন্মদিন' লেখা অক্ষরগুলো বের করে আনে। আমি সেগুলো দেয়ালে আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিই। কাগজের চেইন, ফুল ও বেলুনগুলো ঝুলিয়ে দিই। দেখতে খুব ভালো লাগছে এখন।

-জুঁই, তোমার কাগজের লেখাগুলো সত্যিই সুন্দর হয়েছে। এত সুন্দর কাগজ কাটা শিখলে কোথায়?

-আমার এক বান্ধবীর কাছ থেকে। ওর মামার বিয়ের যাবতীয় জিনিসের দোকান আছে। ও শিখেছে ওর মামার থেকে।

বিকেল সাড়ে পাঁচটার মধ্যে ডেকোরেশন শেষ।

ফুপু রাতের খাবারেরও ব্যবস্থা করেছেন। ৭/৮টি পরিবারকে দাওয়াত করা হয়েছে। নয়নের দু'জন বন্ধু আছে এই মহল্লায়। তারা আসবে বাবা-মাসহ। জুঁইয়েরও দুই বান্ধবীকে বলা হয়েছে।

মেহমানরা সন্ধ্যা সাতটার দিকে আসতে শুরু করেন। আটটার দিকে কেক কাটে নয়ন। দশটার মধ্যে সবার ডিনার শেষ হয়। অনেক ছবি তুলে জুঁইয়ের বান্ধবীরা। বাচ্চারা লাফ-ঝাফ দিয়ে অনেক মজা করে। তিন-চার ঘণ্টা কেটে যায় যেন তিন-চার মিনিটে। একে একে সবাই বিদায় নিয়ে চলে যায়।

রাত ১১টা বেজে গেছে। আমরা সবাই ড্রইংরুমে এসে বসি। ফুপু সবার জন্য চা করলেন। চা খেতে খেতে আমরা নয়নের জন্য আনা প্রেজেন্টগুলো খুলছিলাম। একেকটা প্যাকেট খোলার সঙ্গে সঙ্গে নয়ন উত্তেজনায় চিৎকার করে আনন্দ প্রকাশ করছে। নয়নের আনন্দ আমাদের মধ্যেও ছড়াতে থাকে।
অসাধারণ একটি আনন্দময় দিন কেটে যায়।

আমি হলে ফিরে যেতে চাচ্ছিলাম। কেউ রাজি হলো না। অগত্যা রাতটা থেকে যাই। ড্রইংরুমের ছোট খাটটায় আমি শুয়ে পড়ি। জুঁই আমাকে একটি গল্পের বই দিয়ে যায় পড়ার জন্য। ওর জানা আছে আমি গল্পের বইয়ের পোকা। আমি মশারির মধ্যে ঢুকে বইটা খুলি। শহীদুল্লাহ কায়সারের একটা উপন্যাস। বইটা খুলতেই ভেতর থেকে একটা কাগজ টুপ করে বিছানায় ঝরে পড়ে। ছোট একটা চিঠি। পড়ে ফেলি। নিচে কারো নাম নেই। তবে হাতের লেখা দেখে চেনা যায়। জুঁইয়ের লেখা।

মাসুদ ভাই
আপনি এসেছেন, আমার খুব ভালো লাগছে। জানি না, কেন !
বইটা নিয়ে যাবেন। এটা আপনার জন্য উপহার।

চিঠিটা পকেটে রাখি। ঘুমাতে চেষ্টা করি। কিন্তু ঘুম আসে না।

২

অনেক দিন পর নয়াপল্টনে যাই। বিকেল, ফুপু বাসায় নেই। নিউমার্কেটে গেছেন। ফুপা অফিসে। জুঁই স্কুল থেকে ফিরেছে মাত্র। নয়ন আগেই ফিরেছে।

-মাসুদ ভাই, আপনি সত্যিই অদ্ভুত মানুষ। এত দিন পর এলেন। জুঁই আক্রমণ করে।

-কেন? কোনো প্রয়োজন ছিল ? না মানে, বাসায় কোনো ফাংশন-টাংশন ছিল কি না।

-প্রয়োজন কিংবা ফাংশন ছাড়া আসা যায় না বুঝি? কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে জুঁই বলে।

- যায়। যাবে না কেন ? এক কাপ চা খাওয়াবে জুঁই ?

-বসেন। না, এখানে না, ভেতরে চলেন।

জুঁইয়ের সঙ্গে ওর পড়ার টেবিলের সাথে লাগোয়া চেয়ারটায় বসে পড়ি।

-মাসুদ ভাই, আপনি কেমন মানুষ বলেন তো। সেদিন সকালে আমার বইটি নিয়ে চলে গেলেন।

-কেন, বইটি আমায় উপহার দিলে না! অবাক হয়ে বলি।

-ও আচ্ছা, চিঠিটা তাহলে পড়েছেন। মিটিমিটি হাসতে থাকে জুঁই।

একটু হকচকিয়ে যাই। চিঠি প্রাপ্তির স্বীকারুক্তি এভাবে নিতে পারে, বুঝিনি।

- তা তোমার পড়াশোনা কেমন চলছে ? জিজ্ঞেস করি। সামনে তোমার ম্যাট্রিক পরীক্ষার টেস্ট না?

-মোটামুটি চলছে। পড়ি আর ভুলি। ভুলি আর পড়ি।' জুঁই জানায়। আচ্ছা, আপনি তো নয়নের জন্মদিনের ছবিগুলো দেখলেন না। ছবিগুলো দেখাচ্ছি আপনাকে।

এই কথা বলে সে পাশের রুমে চলে যায়। ফিরে এসে আমার দিকে ছবিগুলো বাড়িয়ে দেয়।

-এই নিন। দেখেন, ছবিগুলো। আমি চা করে আনি।

আমি ছবিগুলো দেখতে থাকি। খুব সুন্দর হয়েছে। কেক কাটার ছবিগুলো সবচেয়ে জীবন্ত। সবার মুখে হাসি। ফুপুদের একটা পারিবারিক ছবি হয়েছে অপূর্ব। জুঁইকে অনেক সুন্দর লাগছে এই ছবিতে। নয়নের মুখে দুষ্টু দুষ্টু হাসি। ফুপা কিছু একটা বলতে যাবেন, ওই মুহূর্তে তোলা হয়েছে এমনি একটা ছবিও রয়েছে।

আমি জুঁইয়ের পড়ার টেবিলটার দিকে তাকাই। টেবিলটা বেশ বড়। বইগুলো র‍্যাকের উপর সুন্দর করে সাজানো। র‍্যাকের এক কোণে 'সঞ্চিতা', 'সঞ্চয়িতা' ও 'হুমায়ূন সমগ্র' দেখা যাচ্ছে।

চা এসে গেল। সঙ্গে চানাচুর ও বিস্কুট। নয়ন দু'টো বিস্কুট তুলে নিল।

-কেমন হয়েছে চা? জানতে চায় জুঁই

-ভালো। খুব ভালো। জুঁই, আমি কি এখান থেকে একটা ছবি পেতে পারি ?

- হ্যাঁ, পারেন। তবে দু'টো শর্ত আছে। বলে জুঁই

-একটা ছবির জন্য দু'টো শর্ত। আচ্ছা, ঠিক আছে।

-প্রথম শর্ত, কোন ছবিটা নেবেন, তা আমি ঠিক করব।

-আচ্ছা। দ্বিতীয় শর্তটা কী ?

ছবিগুলো নাড়াচাড়া করে একটা ছবি আলাদা করল জুঁই। খামে ভরল সেটি। বলল, দ্বিতীয় শর্তটি হলো, খাম খুলে ছবিটা এখন দেখা যাবে না। ব্যাগে রাখুন , পরে দেখবেন।

জুঁই খামটি আমার কাঁধে ঝোলানো ব্যাগের সাইড পকেটে রেখে দিল। আমরা দুজন চুপচাপ চা শেষ করলাম।

জুঁই বলল, চলেন সামনে ড্রইংরুমে গিয়ে বসি। আব্বু এসে পড়বেন এখন।

আমরা ড্রইংরুমে এসে বসি।

-আচ্ছা জুঁই, তোমার জন্মদিন কবে ? জানতে চাই।

-একটা শর্তে জানাতে পারি। হাসতে হাসতে বলে জুঁই।

-আবার শর্ত। আচ্ছা বলো।

- আগামী মাসের ১২ তারিখ। ১২ ফেব্রুয়ারি। শর্তটি হলো, প্রতি জন্মদিনে আমাকে কিছু প্রেজেন্ট করতে হবে।

-ঠিক আছে। পাবে। বলেই আমার ব্যাগ থেকে একটা প্যাকেট বের করি। বলি, ভেতরে একটি বই আছে। গল্পের বই। তোমার আসছে জন্মদিনের উপহার।

-কার বই কাকে দিচ্ছেন ?

-তোমার জন্যই কিনেছি। আমার কাছে, তোমার একটা উপহার পাওনা আছে না ?

জুঁই প্যাকেট থেকে বইটি বের করে আনে। জহির রায়হানের উপন্যাস। 'হাজার বছর ধরে'। বইটি খুলে দেখে। বলে, কিছু লিখে দিন তো।

-সে ক্ষেত্রে একটা শর্ত আছে, বলি। বইটি তুমি ঘরের কাউকে দেখাতে পারবে না।

-ঠিক আছে।

আমি বইটার প্রথম দিকের একটি ফাঁকা পাতায় লিখি 'কিছু কিছু বিনিময় সময় আলিঙ্গনে ফুল হয়'। নিচে স্বাক্ষর করি। যদিও স্বাক্ষর থেকে আমার নাম আবিষ্কার করা কঠিন।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। ফুপা-ফুপু এখনো ফিরছেন না। আমি উঠে পড়ি। জুঁই আমাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেয়।

আমি রাস্তায় এসে রিকশা নিই। ব্যাগের সাইড পকেট থেকে জুঁইয়ের দেয়া খামটি খুলি। জুঁইয়ের ছবি। একা। হাসছে সে।

৩

হলে ফিরতে অযথাই দেরী হল আজ।

চারটা বাজে প্রায়। কিছুক্ষণ পর হাউস টিউটরের অফিস থেকে একটি ছেলে এলো। হাতে একটি কাগজ। কাগজটি বাড়িয়ে ধরে আমার দিকে। বলে, স্যার আপনাকে দিতে বলেছেন। কাগজে লেখা, পল্টনে তোমার এক ফুপা অসুস্থ। যত দ্রত সম্ভব তোমাকে যেতে বলা হয়েছে সেখানে।

আমি আর দেরি করি না। ওই পোশাকেই বের হয়ে রিকশা নিই। আমি বুঝতে পারছি না, কী ধরনের অসুস্থতা হতে পারে। উনার স্বাস্থ্য তো বেশ চমৎকার। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমুতে যান, নির্দিষ্ট সময়ে ওঠেন। খাবারেরও বাড়াবাড়ি নেই। দু'টুকরোর বেশি মাংস কখনো খান না। সকালের নাশতায় মাত্র একটি রুটি। প্রতিদিন হাঁটাহাঁটি করেন। এ রকম মানুষের অসুস্থতা চিন্ত্মা করা কষ্ট।

আমি যখন পৌঁছাই, পাঁচটার মতো বাজে। ফুপা শুয়ে আছেন বিছানায়। পাশ ফিরে শোয়া। জুঁই বাবার খাটের পাশে বসা। যদি বাবা কিছু বলেন, সেটা শোনার জন্য।

ফুপু বলেন, সকালে ফুপা যখন অফিসে যান, উনি একদম ভালো। এগারোটা নাগাদ তার বুকের একটু নিচে ব্যথা শুরু হয়েছে। সামান্য ডান পাশে যেন। ব্যাথাটা কন্টিনিউয়াস। হালকাও না, তীব্রও না। দোকান থেকে অ্যান্টাসিড আনিয়ে খেলেন। কোনো কাজ হলো না। কী আর করা, বসকে জানালেন। বস বললেন, হাসপাতালে যান।

ফুপা হাসপাতালে না গিয়ে বাসায় চলে এলেন। ভাবলেন কমে যাবে। না, কমল না। চারটার দিকে ফুপু আমার হলের নাম্বারে ফোন করালেন।

আমি জিজ্ঞেস করি, ব্যথা এখনো আছে?

জুঁই বলে, হ্যাঁ, এখনো আছে। একটু আগে বাবা বলেছে, ব্যথা এখনো আগের মতো।

-কিছু খেয়েছেন?

-না। খাবার দিয়েছিলাম। উনার নাকি বমি বমি আসছে। ফুপু বলেন।

-আমার মনে হয় ফুপু, ফুপাকে হাসপাতালে নেয়া উচিত। এই ব্যথাটা হার্টের ব্যাথাও তো হতে পারে। আসলে তাড়াতাড়ি চিকিৎসা শুরু হওয়া দরকার। বলি আমি।

ফুপু-ফুপা কিছু বললেন না।

জুঁই বলে, মাসুদ ভাই, আমারও মনে হচ্ছে আমরা সময় নষ্ট করছি। তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নেয়া দরকার।

-তাহলে আপনারা তৈরি হন। আমি একটি ট্যাক্সি নিয়ে আসছি।

আমি ফুপুর দিকে তাকালাম। ফুপু তাকালেন ফুপার দিকে। ফুপা ফিসফিস করে বলেন, সেই ভালো। চলো হাসপাতালে। ব্যথাটা আর সহ্য করতে পারছি না।

আমি নেমে যাই বাসা থেকে। গলির মোড়ে কোনো ট্যাক্সি নেই। আরো সামনে এগোই, বড় রাস্তার মোড়ে। এখানে দুটো গাড়ি পাশাপাশি দাঁড়ানো। সহজেই ভাড়া করা গেল। কিন্তু গলির মধ্যে ঢুকতে চাইছে না। কী আর করা। ফুপাকে ধরে নিয়ে আসতে হবে।

ফুপা আমার কাঁধ ধরে ছোট ছোট পা ফেলে এসে বসলেন গাড়িতে। ফুপা, ফুপু ও আমি পেছনে আর জুঁই সামনে বসল। নয়ন থাকল বাসায়।

ঢাকা মেডিকেলের ইমার্জেন্সিতে যাই আমরা। ওরা পরীক্ষা করে ভর্তি করে নেয় ফুপাকে।

মেডিসিন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হল। ওই ওয়ার্ডের সহকারি রেজিস্ট্রার ও রেজিস্ট্রার আসেন। পরীক্ষা করে অনেকগুলো ইনভেস্টিগেশন করতে দেন। পাশাপাশি ওষুধও দেন । হাতে স্যালাইন লাগানো হলো। ইনজেকশন দেয়া হলো। ঘণ্টাখানেক পর ব্যথাটি আস্তে আস্তে কমে আসে।

ফুপা ঘুমাচ্ছেন। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি, ঘড়িতে রাত সাড়ে নয়টা।

আমি ফুপুকে বলি, আপনারা চলে যান, আমি আছি ফুপার সাথে। তা ছাড়া বাসায় নয়ন একা। এটা জেনারেল ওয়ার্ড। বাড়তি কোনো বিছানা নেই এখানে। জুঁই ঘোষণা করে, আমি থাকি, আপনারা বরং চলে যান।

-দেখো, এটা ছেলেদের ওয়ার্ড। তোমাকে একা এখানে অ্যালাউ করা হবে না।

জুঁই আর কিছু বলে না। আমি জুঁই ও ফুপুকে রিকশা করে দিই। খুব বিমর্ষ ভঙ্গিতে তাঁরা রিক্সায় ওঠেন।

ওয়ার্ডে গিয়ে দেখি, একজন প্রফেসর এসেছেন ব্লুগি দেখতে। অন্য ডাক্তাররাও আছেন তার সঙ্গে। ফাইলের সব কাগজপত্র দেখলেন। ওই সময় বুকের ও পেটের এক্স-রে প্লেট এল। প্লেটগুলো অনেকক্ষণ চেক করলেন। আমাকে বললেন, কে হন ব্লুগি আপনার?

-ফুপা, আমার ফুপা হন উনি।

-এই দেখেন, এক্স-রে প্লেটের উপর ইঙ্গিত করলেন উনি। এখানে তিনটা পাথর দেখা যাচ্ছে। ছোট পাথর। পিত্তথলিতে এগুলো। এ কারণেই রোগির ব্যথা হচ্ছিল বুকের কাছে। ঘাবড়াবার কিছু নেই। অপারেশন করে পাথরগুলো ফেলে দিতে হবে। তাহলেই উনি ভালো হয়ে যাবেন।

-অপারেশন না করলে হয় না? জানতে চাই।

-না। অপারেশনই এর চিকিৎসা। প্রফেসর সাহেব বলেন।

-কবে অপারেশনটা করতে হবে?

-তিন মাসের মধ্যে। আমরা এখন ওষুধ দেব যাতে ব্যথাটা না ওঠে। রক্ত পরীক্ষার কাগজগুলো আসুক। আমরা কাল-পরশু রোগিকে ছেড়ে দেব। পরে সার্জারি ওয়ার্ডে ভর্তি হলে তারা অপারেশনের ব্যবস্থা করবে। প্রফেসর সাহেব দলবল নিয়ে চলে গেলেন।

-তাকিয়ে দেখি ফুপা জেগে উঠেছেন। বলি, ডাক্তার যা বলেছে, শুনেছেন ফুপা?

-হ্যাঁ শুনেছি। যাক্, প্রকৃত কারণটি জানা গেল। আমি তো মনে করেছিলাম হার্টের সমস্যা। ফুপা আবার চোখ বুঝলেন। বোধকরি ঘুমিয়েও পড়লেন। সম্ভবত ফুপাকে ঘুমের ওষুধ দেয়া হয়েছে। আমি নিচে নেমে আসি।

হাসপাতালের কাছাকাছি একটা দোকান থেকে রুটি ও কলা কিনি। ক্ষুধা লেগেছে খুব। এতক্ষণ টের পাইনি। চা খাই পর পর দুই কাপ।

ফুপার বিছানার কাছে একটা টুল পাওয়া গেল। টুলটি দেয়ালের গাঁয়ে মিশিয়ে সেটায় বসি। হেলান দিই দেয়ালে। একটু তন্দ্রার মতো লাগছিল। ফুপা ঘুমাচ্ছেন অঘোরে। হাতে স্যালাইন চলছে। চোখ বন্ধ করে ফেলি।

চোখ খুলে দেখি ঘড়িতে চারটা বাজে। কাছেই কোথাও আজান হচ্ছে। উঠে দাঁড়াই। ফুপা ঘুমাচ্ছেন। পাশের বেডে এক রোগি ব্যাথায় কোকাচ্ছে। নার্স এসে তাকে ইনজেকশন দিলেন।

আমি হাসপাতাল থেকে নেমে রাস্তার ও-পাশে একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে পড়ি। চোখ-মুখে পানি দিই। নাশতা এখনো হয়নি ওদের। তবে চা দিতে পারবে জানাল।

চা আসে। চা খেয়ে ফিরে যাই ফুপার কাছে।

সকালের সূর্যের প্রথম আলোয় ভাসছে পৃথিবী। মনটা ভালো হয়ে গেল হঠাৎ। আমার বাম পাশে একটা ছায়া দেখতে পাই। তাকিয়ে দেখি জুঁই।

- কখন এলে? জিজ্ঞেস করি।

-এই তো ঢুকলাম। ওর চোখে হাজারো প্রশ্ন। আমি গতরাতের প্রফেসর সাহেবের বলা সব কথা জুঁইকে জানাই।

সব শুনে জুঁই স্বস্তি বোধ করে। জিজ্ঞেস করে, তার মানে, আজ বিকেলে বাবাকে ওঁরা ছেড়ে দেবেন?

-মনে হয় তাই।

আমরা ওয়ার্ডের পাশে বারান্দায় এসে দাঁড়াই। সকালের ঢাকা শহরকে দেখা যাচ্ছে। বোধকরি জুঁইয়েরও আমার মতো ভালো লাগছে। আমরা অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকি।

হঠাৎ জুঁই বলে, তোমার হাতটা কি ছুঁতে পারি?

-হ্যাঁ পারো। জুঁই তার ডান হাতটা আমার বাম হাতের উপর রাখল। আমি দুই হাতের মধ্যে জুঁইয়ের হাতটা নিয়ে নিলাম। অনুভব করতে লাগলাম জুঁইকে। উফ্, কী সুন্দর এই পৃথিবী। কী সুন্দর এই বেঁচে থাকা।

শাফিন রাশেদ : লেখক ও চিকিৎসক